হিন্দুধর্মের দর্শন

ইউনিট 4

ভূমিকা

হিন্দুধর্মের দর্শন হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজিত, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি নিরাকার আবার কখনওবা সাকার – এই বিশ্বাস পোষণ করা। এছাড়া ধর্মচেতনা, ধর্মীয়ভাবাবেগ, দেব-দেবী, আত্মা, পরলোক, ধর্মীয় আচার, বিধি-নিষেধ, সামাজিক নিয়ম-প্রথা প্রভৃতি ধর্ম-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দুধর্ম নানা মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পবিত্র জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। মনুষ্যত্ব অর্জনের মাধ্যমে সৎ ও মহৎ হতে শেখায়। হিন্দুধর্মে আত্মার ধ্বংস নেই, শুধু দেহেরই ধ্বংস হয়। যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ। জীবের হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থান। হিন্দুধর্ম এই বোধ জাগ্রত করে। এই বোধ থেকে আসে অপরের প্রতি ভালোবাসা। জীব মাত্রই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ।

মোট কথা হিন্দুধর্মীয় দর্শন কোনো মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে সহায়তা করে। মানুষকে জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণ সাধন করে। ধার্মিককে ন্যায় পথে চলতে সহায়তা করে ।

এ ইউনিটে ধর্ম-দর্শনের বিষয় – ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ইহলোক এবং পরলোক, জন্মান্তরবাদ, স্বর্গ-নরক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৪.১ : হিন্দুধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব
পাঠ ৪.২ : যোগসমূহ
পাঠ ৪.৩ : হিন্দুধর্মে ইহলোক
পাঠ ৪.৪ : জন্মান্তরবাদ
পাঠ ৪.৫ : স্বর্গ-নরক

পাঠ-৪.১ হিন্দুধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধর্ম কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয় কেন ? উল্লেখ করতে পারবেন।
- ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন জনের উপলব্ধি উল্লেখ করতে পারবেন।
- ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ধারণ, পবিত্র, ধৃতি, দম, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ক্রোধহীনতা, মহাপুরুষ, পক্ষপাতশূন্য, মনুষ্যত্ব, স্রষ্টা , সর্বশক্তিমান, উপলব্ধি, অনন্তভাব, অনন্তরূপ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, ভক্ত ইত্যাদি।

ধর্মতত্ত্ব :

ধর্ম ও তত্ত্ব = ধর্মতত্ত্ব। ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত ধৃ ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে (ধৃ+মন্ = ধর্ম)। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। অর্থাৎ যা মানুষকে ধারণ করে রাখে তাই ধর্ম।

ধর্ম সত্য সুন্দর পবিত্র জীবন যাপনের পথ নির্দেশ করে এবং সকল প্রকার কল্যাণ সাধন করে। কাজেই আমাদের ধর্ম মেনে চলা উচিত।

ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ :

ধর্মের স্বরূপ কতগুলো গুণের সমষ্টি। সে গুণগুলো যার মধ্যে থাকে তিনিই ধার্মিক। মনুসংহিতায় ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার ভেতর ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায় –

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দিয়সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা – এই দশটি লক্ষণের মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায় । মনুসংহিতায় ধর্মের আরও চারটি সাধারণ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে – বেদ, স্মৃতি, সদাচার, বিবেকের বাণী ।

বেদ : বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান বা সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডার। বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদ ইশ্বরের বাণী। প্রাচীনকালে জীবন ও জগতের উৎস খুঁজতেন সাধক বা ঋষিরা। এই ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান বেদ। বেদ চারটি – ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বেদ।

স্মৃতিশাস্ত্র : ধর্মের দ্বিতীয় প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ। এগুলো বেদের পরে কর্তব্য কর্মের উপদেশ দিয়ে রচিত। স্মৃতিশাস্ত্রগুলো বেদের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে রচনা করা হয়েছে। মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম মেনে চললে ধর্মাধর্ম নির্ণয় সহজ হয়।

সদাচার : স্মৃতিশাস্ত্রে কোনো বিষয়ে উপদেশ না পেলে মহাপুরুষগণের আচরণ বা উপদেশ অনুসরণ করে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করতে হয়।

বিবেকের বাণী : বেদ, স্মৃতি, সদাচার ছাড়াও বিবেকের বাণী মেনে চলাও ধর্ম। তাই বিবেকবুদ্ধি সুন্দর ও পক্ষপাতশূন্য হতে হয়।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা : ধর্ম পালন করলে জীবন সুন্দর হয়। ধর্ম নষ্ট করলে অমঙ্গল হয়। ধর্মের মাধ্যমে ধন, মান, যশ, সুখ-শান্ড়ি ইত্যাদি লাভ হয়। পরলোকেও মঙ্গল সাধিত হয়। ধর্ম মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করে। আবার ধর্ম পালনে মানবজীবনের পরমপ্রাপ্তি মোক্ষলাভও সম্ভব হয়।

শাস্ত্রে আছে – "ধর্মমূলং হি ভগবান্" অর্থাৎ ভগবান ধর্মের মূল। ধর্ম পালন করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন।

ধর্মহীন লোক পশুর সমান। ধর্মচর্চার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। ধর্ম ছাড়া কোনো দেশ জাতি উন্নতি করতে পারে না। তাই মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সকলের ধর্ম মেনে চলা উচিত।

ঈশ্বরতত্ত্ব :

ঈশ্ ধাতুর সঙ্গে বরচ্ প্রত্যয়যোগে ঈশ্বর শব্দটি গঠিত হয়েছে। ঈশ্বর সকল কিছুর স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনি পালনকর্তা-ধ্বংসকর্তা। তাঁর জন্ম নেই, মুত্যু নেই। সব কিছুই তাঁর অধীন কিন্তু তিনি কোনো কিছুরই অধীন নন। তিনি রয়েছেন সর্বত্র। তাঁর অনন্ড়ভাব, অনন্ড়রূপ। ঈশ্বরকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা, ভক্তের কাছে তিনি ভগবান।

ব্রহ্ম : ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ সর্ববৃহৎ। তিনি নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন তিনিই আবার বিনাশ করেন। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী অবস্থান করেন বলে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁকে পরমাত্মা বলে ।

আত্মা: আত্মা নিত্য বস্তু। আত্মার জন্ম বা বিনাশ নেই। আত্মাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, আগুনে দগ্ধ করা যায় না। আত্মা নশ্বর, নিরাকার, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন করে। আত্মাকে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়।

ঈশ্বর : ব্রহ্মই ঈশ্বর। ব্রহ্ম যখন সকলের উপর প্রভুত্ব করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলে। ধ্যানের মাধ্যমে ঋষিগণ উপলব্ধি করলেন ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি যখন অবতার রূপে পৃথিবীতে আসেন তখন মানুষ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি অনন্ত অসীম। তিনি জগতের আদি কারণ, বিধাতা। তিনি শাশ্বত। ঈশ্বর নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন তাই তাঁকে স্বয়ম্ভূ বলে। তিনি নিত্য শুদ্ধ পরম পবিত্র। ঈশ্বর সর্বকর্মের ফলদাতা। যার যার কর্মানুসারে ঈশ্বর সেরকম ফল দিয়ে থাকেন। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন।

ভগবান : ঈশ্বরকে যখন সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাজ্ঞের অধীশ্বরূপে কল্পনা করা হয় তখন তাঁর নাম হয় ভগবান । ঋষিগণ এই ঈশ্বরকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান এ তিনভাবে উপলব্ধি করেন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। ভগবান গুণময়; তিনি অনন্তরূপ ও অশেষ গুণের আধার। তিনি রসময়, আনন্দময়। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট রূপ ও ভাব প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। কখনও প্রিয় ভক্তের জন্য ভগবান নিজেই ভক্তের সেবা করেন।

ভগবানের স্বরূপ :

ঈশ্বরের সাকার রূপকে ভগবান বলা হয়। ভগবান রসময় ও আনন্দময়। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর রূপের কোনো শেষ নেই। ভক্তগণ যে রূপে ভগবানকে ডাকেন, তিনি সে রূপেই ভক্তকে দেখা দেন ও লীলা করেন। ভগবান সমস্ত জগৎ জুড়েই আছেন। তাইতো কবি রজনীকান্ত লিখেছেন :

আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে
আছ বিটপী লতায়, জলদের গায়
শশী তারকায়, তপনে ।।

ভগবান মন, বুদ্ধি ও হৃদয়ে আছেন। তিনি অন্তর্যামী। আমাদের সকল কিছুর নিয়ন্তা তিনি। আমাদের আত্মায় তাঁকে পাওয়া যায়, পাওয়ার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই রয়েছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• মনুসংহিতায় ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। • ভগবানের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ :

যা মানুষকে ধারণ করে রাখে এবং কল্যাণ করে তাই ধর্ম। মনুসংহিতায় ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যেমন – সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দিয়সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা এবং ধর্মের আরও চারটি সাধারণ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে – বেদ, স্মৃতি, সদাচার, বিবেকের বাণী। এই লক্ষণের মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায় । তাই আমাদের ধর্ম মেনে চলা উচিত।

ঈশ্বর সকল কিছুর স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনি পালনকর্তা-ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বরকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা, ভক্তের কাছে তিনি ভগবান। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট রূপ ও ভাব প্রত্যক্ষ করতে পারেন। আত্মায় তাঁকে পাওয়া যায়, পাওয়ার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

পাঠ-৪.২ যোগসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কর্ম কী তা বলতে পারবেন।
- কর্মের প্রকারভেদ নির্ণয় করতে পারবেন।
- সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জ্ঞান কী তা বলতে পারবেন।
- জ্ঞানযোগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- জ্ঞানযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভক্তিযোগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মোক্ষলাভ, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি, চঞ্চলতা, মায়াজাত, সকাম, নিষ্কাম, আত্মতত্ত্ব, পরমার্থতত্ত্ব, ব্রহ্মময়, চৈতন্যময়, জীবাত্মা, পরমাত্মা, মোহিত, সংযতেন্দ্রিয়, ঐকান্তিক, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আরাধনা, অসীম, মুক্তি, ভগবৎ, হোম, জপ, ব্রত, নিয়ম ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

কর্মযোগ :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ। মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভের জন্য বিভিন্ন সাধন পদ্ধতি রয়েছে। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এগুলি ঈশ্বর লাভের এক একটি পদ্ধতি। অতি নিষ্ঠার সাথে এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে।

কোনো কিছু করাকে কর্ম বলে। মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনধারণের জন্য কর্ম করতে হয়। আর কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মুক্তিলাভের সাধনাকে কর্মযোগ বলে। আদর্শকর্মীকে যোগ অবলম্বন করে কর্ম করতে হয়। যোগ হচ্ছে মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা থেকে মুক্ত রাখার উপায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (গীতা, ৩/৫)

হে পার্থ, কর্ম না করে কেউ থাকতে পরে না, কেননা সকলকেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়।

কর্ম দুই প্রকার – সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যে কর্ম করা হয় তাকে সকাম কর্ম বলে। এ কর্ম কামনা–বাসনা যুক্ত। সকাম কর্মের বৈশিষ্ট্য হলো –

ক. ব্যক্তি মনে করে কর্মটি আমার,
খ. আমার কর্ম আমি করি,
গ. কর্মফলের ভাগীও আমি।

আর যে কর্মে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাকে নিষ্কাম কর্ম বলে। কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি মনে করেন, সমস্ত কর্মই ঈশ্বরের, কর্মের ফলও ঈশ্বরেরই প্রাপ্ত, ঈশ্বর তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন মাত্র। নিষ্কাম কর্মের বৈশিষ্ট্য হলো –

ক. ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ
খ. কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ
গ. কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ

সকাম কর্মে কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির কর্তৃত্বাভিমান থাকে। তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করেন না, তাঁকে ভুলে যান, এজন্য সকাম কর্মের ফলাফল যা হোক না কেন তাকে ভোগ করতে হয়। সকাম কর্মের ফল বন্ধনযুক্ত। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন – কর্মে বন্ধন হয় না, বন্ধন হয় কামনা-বসনার জন্য। বসনাযুক্ত হয়ে কর্ম করলে, সে কর্মে বন্ধন হয়। কিন্তু বাসনামুক্ত হয়ে ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ করে কর্ম করলে কর্ম হয় নিষ্কাম কর্ম। এই নিষ্কাম কমের্র সাহায্যেই মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে।

জ্ঞানযোগ :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ। জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা। আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকেই জ্ঞান বলা হয়। এই জানার মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। আত্মতত্ত্বের আলোকে জগতের সত্তাকে জানার নাম জ্ঞান।

জ্ঞানী ব্যক্তি জগতের অবস্থা জেনে সকল কিছুর উপরে স্রষ্টাকে অনুভব করেন। তিনি মনে করেন, তাঁর নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের জীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সকলে একই চেতনায় অবস্থান করছে। জগতের সবকিছু ব্রহ্মময়, চৈতন্যময়। এই চৈতন্যই আত্মতত্ত্ব । আর প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে জীবাত্মা রয়েছে তাকেই পরমাত্মা বলে। এই পরমাত্মার জ্ঞানই পরমার্থতত্ত্ব। এই পৃথিবীতে আমরা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আছি। মায়া কেটে গেলে আত্মতত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। তখন আমরা বুঝতে পারি আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব একই। আর এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। (৪/৩৮)

অর্থাৎ, হে পার্থ, এ জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের পরিপক্ব ফল। অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেন, তিনি আত্মায় পরম শান্তি লাভ করেন।

জ্ঞানলাভের অধিকারী ব্যক্তির আচরণ সুন্দর হয়, কোনো ভেদাভেদ থাকে না, সর্বত্র সমবুদ্ধি, বাসনা শুদ্ধ হয়, অহংকার থাকে না, হিংসা থাকে না, সরলতা, গুরুসেবা, পবিত্রভাবে থাকা, জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, তন্ময়তা, সাধনা, সংযতেন্দ্রিয় ইত্যাদি গুণ প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞানীর এরূপ কুড়িটি লক্ষণের উল্লেখ আছে। এখানে জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটি কথা আছে – কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম। শাস্ত্রে যে সকল কাজ করতে বলা হয়েছে তা কর্ম এবং কোনো কাজ না করাকে বলা হয় অকর্ম। আর যা নিষেধ করতে বলা হয়েছে তা বিকর্ম।

"সদা সত্য কথা বলবে" – এ হলো শাস্ত্রের নিয়ম সুতরাং কর্ম। কিন্তু সত্য কথায় যদি অন্যের প্রাণহানি হয় তা বিকর্ম। মিথ্যা কথা বলা অকর্ম।

জ্ঞানীরা বিবেক অনুসারে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন।
জ্ঞানলাভের ফল –

১। অজ্ঞানতা ও শোকাদি মোহ দূর হয়।
২। সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।
৩। কর্মের বন্ধন থাকে না। জ্ঞানী পরম সুখে অবস্থান করেন।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন – জ্ঞানী ভক্তই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। তাই জ্ঞানলাভের জন্য আমরা সকলে যত্নশীল হব।

ভক্তিযোগ :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই ভক্তি। আর ভক্তিভাবে ঈশ্বরের আরাধনাকে ভক্তিযোগ বলে। শাস্ত্রে আছে ভক্তিতে ভগবান, অভক্তিতে অপমান। ভক্তির অসীম শক্তি। ভক্তিতেই মুক্তি। যার যেমন ভক্তিভাব তার তেমন লাভ। ভক্ত ভগবানের মিলনসূত্র ভক্তি। ভক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মার্গ কেননা কর্ম থেকে আসে জ্ঞান আর জ্ঞান থেকে আসে ভক্তি।

শান্ডিল্যসূত্রে ভক্তির লক্ষণ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে – ভগবৎ পদে যে একান্ত রতি, তার নামই ভক্তি। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে – ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলে। জীবের মধ্যে আনন্দভাব রয়েছে, সে ভাব প্রকাশিত হয় কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে। এই কামনা ঈশ্বরমুখী হয়ে বিশুদ্ধ হলেই ভক্তিতে পরিণত হয়। তাই ভক্তি কামনা বাসনা মুক্ত হতে হবে। যদি কোনো কামনা অন্তরে থাকে তা শ্রীভগবানে অর্পণ করবে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা ভক্তের মনে স্থান পাবে না। হোম, জপ, ব্রত নিয়ম – এ সমস্তই ভগবানের প্রীতির জন্য সম্পাদন করতে হবে। মোট কথা ধর্ম, অর্থ, কাম – এই ত্রিবর্গ যা সংসারী ব্যক্তিদের সম্পাদন করতে হবে। এইভাবে যে ভক্তগণ শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁদের অন্তরে ভক্তি জন্মে। আর যাঁর অন্তরে নিরন্তর বিশুদ্ধ ভক্তিভাব জাগ্রত হয়েছে তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেন। এ সম্পর্কে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। (৯/২২)

অর্থাৎ হে পার্থ, অনন্যচিত্ত হয়ে আমার চিন্তা করতে করতে যে ভক্তগণ আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করে থাকি অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণ করে থাকি।

ভক্ত সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। ভক্ত জানেন, ঈশ্বর রয়েছেন সকলের হৃদয়ে, সর্বভূতে। যিনি সর্বভূতে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন তিনি যথার্থ ভক্ত। এরূপ ভক্ত শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের দ্বারা নবধা ভক্তিপরায়ণ হয়ে ভজনা করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন।

মোট কথা যিনি ভোগ-বাসনা, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ ত্যাগ করে ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত হন ভগবান তাঁর বোঝা বহন করেন। আদর্শ ভক্তের পাপ-তাপ দুঃখ-বেদনা থাকে না। ভক্তির মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য আলোচনা করুন। • জ্ঞানলাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

কোনো কিছু করাকে কর্ম বলে। কর্ম দুই প্রকার – সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যে কর্ম করা হয় তাকে সকাম কর্ম বলে। আর যে কর্মে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাকে নিষ্কাম কর্ম বলে। নিষ্কাম কর্মের সাহায্যেই মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে। সকলকেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে হয়।
জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা। আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকেই জ্ঞান বলা হয়। এই জানার মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে জীবাত্মা রয়েছে তাকেই পরমাত্মা বলে। এই পরমাত্মার জ্ঞানই পরমার্থতত্ত্ব। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পরলেই যথার্থ জ্ঞানী হওয়া যায়।
ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই ভক্তি। আর ভক্তিভাবে ঈশ্বরের আরাধনাকে ভক্তিযোগ বলে। যে ভক্তগণ শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁদের অন্তরে ভক্তি জন্মে। আর যাঁর অন্তরে নিরন্তর বিশুদ্ধ ভক্তিভাব জাগ্রত হয়েছে তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেন।

পাঠ-৪.৩ হিন্দুধর্মে ইহলোক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইহলোক সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সমগ্র জীবনের স্তরগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মানবজীবনের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কলিযুগের করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	আয়ুষ্কাল, স্তর, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ , সন্ন্যাস, গুরুগৃহ, দীক্ষাগ্রহণ, অধ্যয়ন, সুশীল, আত্মসংযমী, পরিশ্রমী, শ্রদ্ধা, অর্চনা ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকে ইহলোক বলে। পুরাণে পরাশর মুনি মানুষের সমগ্র জীবন বা ইহলোককে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মানুষের আয়ুষ্কাল ধরা হয় একশ বছর। এই শত বর্ষের জীবনকে পঁচিশ বছর করে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পঁচিশ বছরকে বলা হয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় পঁচিশ বছরকে বলা হয় বানপ্রস্থ এবং শেষ পঁচিশ বছরকে বলা হয় সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্য : ছাত্রজীবনকে মূলত ব্রহ্মচর্য কাল হিসেকে ধরা হয়। এ সময় হচ্ছে এক থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত। এটি জীবনের মহামূল্যবান সময়। পাঁচ বছর বয়স হলেই গুরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। এ সময় গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ, গুরুর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা ও পবিত্রতা পালন করার। এ সময়ে গুরুর নির্দেশে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, সুশীল, আত্মসংযমী, পরিশ্রমী, শ্রদ্ধাশীল ও কঠোর জীবনযাপনের অভ্যাস করতে হয়।

গার্হস্থ্য : ব্রহ্মচর্য শেষে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের নাম গার্হস্থ্য আশ্রম। এ সময় হচ্ছে পঁচিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত। বিবাহের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি লাভ করে, তাদের ভরণ-পোষণসহ পারিবারিক দায়িত্ব পালন করবে। জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ কর্মের অনুশীলন করতে হবে। যেমন : পিতৃযজ্ঞ, মাতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ। গৃহস্থ কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। শঠতাপূর্ণ আচারণ করবে না। কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত আসক্ত হবে না। শত্রুর নিকট হবে বীর এবং গুরুজনের নিকট হবে বিনীত। সযত্নে বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম অর্জন করবে।

বানপ্রস্থ : এ সময় হচ্ছে পঞ্চাশ বছর থেকে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত। যেখানে গৃহস্থ সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পুত্রের ওপর অর্পণ করে নির্জন পরিবেশে অবসর জীবনযাপন করবে। এ সময় স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে পারেন তবে জীবনচর্চায় সংযম, ত্যাগ, নির্লোভ আচারণ করতে হবে। বানপ্রস্থে বনে যাওয়ার বিধান থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ বনবাসী না হয়ে গৃহ ত্যাগ করে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সেবা পূজা অর্চনার মাধ্যমে বৈরাগ্যময় জীবনযাপন করতে পারেন। বানপ্রস্থী ফল, মূল ও বৃক্ষপত্র আহার করে ভূমিতে শয়ন করবেন। এ সময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভজন, পূজন, কীর্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ধর্মচর্চা করবেন।

সন্ন্যাস : মানুষের জীবনের শেষ পঁচিশ বছরকে বলা হয় সন্ন্যাস। এ সময় হচ্ছে পঁচাত্তর বছর থেকে একশ বছর পর্যন্ত। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে সন্ন্যাসী একাকী ভিক্ষা করে জীবনধারণ করবেন। মস্তক মুন্ডন করবেন। পুত্র, কন্যা, স্ত্রী এবং সকল কিছুতে মমতাশূন্য হবেন। শত্রু-মিত্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র সকল প্রাণীকে মিত্ররূপে গ্রহণ করবেন। কোনো প্রাণীর অনিষ্ট করবেন না। সর্বদা যোগরত অবস্থায় থাকবেন এবং সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন।

তবে বর্তমান কলিযুগে ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম নেই বললেই চলে। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই দুটি আশ্রম লক্ষ্য করা যায়। তবে গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা এদের পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণে উৎসাহিত করা হয় না। তাই কলিযুগে গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে জীবনযাপন করাই ভালো। এতেই জীবন সার্থক হয় এবং কল্যাণময় হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• **গৃহস্থের কর্তব্য কী ?**

সারসংক্ষেপ :

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকে ইহলোক বলে। মানুষের আয়ুষ্কাল ধরা হয় একশ বছর। এই শত বর্ষের জীবনকে পঁচিশ বছর করে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পঁচিশ বছরকে বলা হয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় পঁচিশ বছরকে বলা হয় বানপ্রস্থ এবং শেষ পঁচিশ বছরকে বলা হয় সন্ন্যাস।

পাঠ-৪.৪ জন্মান্তরবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জন্মান্তরবাদ কী তা বলতে পারবেন।
- দেহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দেহ ও জীবাত্মার পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	জন্মান্তর, কর্মফল, দার্শনিক, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, জীবাত্মা, পরমাত্মা, আবর্তে, অবিনাশিতাবাদ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

হিন্দুধর্ম ও দর্শনে বেশিরভাগ ধর্মসম্প্রদায় জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তর শব্দের অর্থ অন্য জন্ম বা পরবর্তী জন্ম। কর্ম করলে তার ফল আছে। কর্মকারীকে সেই ফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগ এক জন্মে শেষ না হলে পরবর্তী জন্মে তা ভোগ করতে হয়। এই ভোগের নিমিত্ত যে জন্ম তাই জন্মান্তর । আর এই জন্মান্তর সম্পর্কে দার্শনিক যে চিন্তা-ভাবনা তাকে জন্মান্তরবাদ বলে।

আমাদের দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুটি শাশ্বত বস্তু অবস্থান করছে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মা অব্যয়, এই আত্মার ধংস নেই, বিনাস নেই, জন্ম-মৃত্যুহীন চিরন্তন, দেহকে আশ্রয় করে সজীব হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম – এই পঞ্চভূতে গড়া আমাদের দেহ। এই দেহের বিনাশ আছে। যিনি দেহ ধারণ করে তারই দেহ নাশ নিশ্চিত হয়ে রয়েছে। গীতায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। অপরদিকে 'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্মও সুনিশ্চিত। যত দিন পর্যন্ত জীবাত্মা সুকর্মের মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে লীন না হবে তত দিন জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পৃথিবীতে আসতে হবে। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী। (২/২২)

অর্থাৎ হে পার্থ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনিই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের দেহ শুধুমাত্র বহুবার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। জীবাত্মার মৃত্যুর অর্থ হলো দেহত্যাগ। আমাদের জীবদেহে যেমন বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য কালের গতিতে আসে তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিও ঘটে। এভাবে জীবদেহের জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণই জন্মান্তরবাদ প্রক্রিয়া।

এই জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্মবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আত্মার অবিনাশিতাবাদ এবং জন্মান্তরবাদের ন্যায় কর্মবাদও হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি স্বরূপ। কর্মবাদের মূল কথা হল, বিশ্বজগৎ স্রষ্টার বিরাট কর্মক্ষেত্র। এখানে জীব কামনা-বাসনা ও চেষ্টার দ্বারা নানা রকম কাজ করে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটি কর্মে রয়েছে পৃথক প্রথক কর্মফল। হিন্দুধর্ম অনুসারে কর্ম করলেই কর্মফল ভোগ করতে হবে। এ কর্মফল ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মানবের মুক্তি হবে না। নিষ্কামভাবে কর্ম করলে যে ফল

উৎপন্ন হবে তা কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হবে না। সুতরাং নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন করাই সঙ্গত কাজ। নিষ্কাম কর্ম করে জীব মুক্তি লাভ করতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• **পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করুন।**

সারসংক্ষেপ :

কর্মকারীকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগ এক জন্মে শেষ না হলে পরবর্তী জন্মে তা ভোগ করতে হয়। এই ভোগের নিমিত্ত যে জন্ম তাই জন্মান্তর । আর এই জন্মান্তর সম্পর্কে দার্শনিক যে চিন্তা-ভাবনা তাকে জন্মান্তরবাদ বলে।

পাঠ-৪.৫ স্বর্গ ও নরক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্বর্গে কী কী আছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	পুণ্যময়, শ্রুতিশাস্ত্র, যজ্ঞ, জরা, ব্যাধি, নন্দনকানন, মন্দাকিনী, অমরাবতী, সুরভী, বৈজয়ন্ত ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

স্বর্গঃ

মানুষের শুভকর্মের পুণ্যময় ফল ভোগের জন্য মৃত্যুর পর যে সুখময় ফল লাভ হয় তাকে স্বর্গ বলে। আর পাপকর্মের ফল ভোগের জন্য যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাকে নরক বলে। শ্রুতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে – "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামনা করে যজ্ঞ করবে। স্বর্গকামনা করে যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করবে।

স্বর্গে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ হয়ে থাকে। সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোক নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই লোক সর্বদা সুখময়। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি কিছুই নেই।

পুরাণে স্বর্গ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। স্বর্গ দেবতাদের বাসস্থান। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র স্বর্গে বাস করেন। ইন্দ্র কোনো ব্যক্তির নাম নয়। এটি স্বর্গের রাজার পদবী। ইন্দ্র যে প্রাসাদে বাস করেন তার নাম বৈজয়ন্ত। ইন্দ্রের বাহন হাতি, হাতিটির নাম ঐবারত।

ইন্দ্রের দেবসভার নাম সুধর্ম। স্বর্গের উদ্যানের নাম নন্দনকানন, নদীর নাম মন্দাকিনী। স্বর্গের রাজধানী অমরাবতী। পারিজাত পুষ্পের সুরভীতে স্বর্গ আমোদিত। স্বর্গবাসীদের খাদ্য অমৃতময় এবং ভোগের সামগ্রী হলো সুরভী গাভীর দুগ্ধ। স্বর্গ সুখভোগের জায়গা হলেও এখানে জীব চিরকাল অবস্থান করতে পারে না। পুণ্যফলে স্বর্গবাস হয়, তবে ভোগের মধ্য দিয়ে পুণ্য ক্ষয় হয়। পুণ্যক্ষয় হলে স্বর্গভোগের অবসান হয়। তখন জীবকে পুনরায় মর্ত্যলোকে দেহধারণ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের দেহ নষ্ট হয়। তখন কর্মফল ভোগের জন্য সূক্ষ্ম দেহের উদ্ভব হয়। ঐ সূক্ষ্ম দেহ নিয়েই জীব স্বর্গসুখ বা নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এখন মূল কথা হলো কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সর্গে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, এব্যাপারে শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে –

তারাই স্বর্গে যেতে পারেন যারা সকল হিংসা ত্যাগ করেছেন, যারা সহিষ্ণু হয়ে সব কিছু সহ্য করেন। যারা সকলের প্রতিপালন করেন।

মোট কথা পুণ্যবান ব্যক্তি স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

নরক : মানুষকে তার পাপ কর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হয়, এই শাস্তি ভোগের স্থানটিকে বলা হয় নরক। পাপ কর্মানুসারে পাপীরা নরক ভোগ করে থাকে। নরক পাপীদের দুঃখভোগের জায়গা। পাপীদের পাপের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন রকমের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

ভগবতে নরক সম্পর্কে বলা হয়েছে – যমরাজ কিঙ্করদের সাহায্যে পাপী ব্যক্তিদের বিচার করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ৮৬ টি নরককুন্ডের বর্ণনা রয়েছে। যেমন – তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন ইত্যাদি নরক । এখানে কয়েকটি অপরাধ এবং তার জন্য কীরকম নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তা বর্ণনা করা হলো :

১. যারা পরধন, পরস্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে যম পুরুষেরা তাদেরকে কঠিন পাশে আবদ্ধ করে তামিস্র নরকে ফেলে দেয়। এই নরক নিবির অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাপী এখানে পতিত হয়ে খাদ্য-পানীয় অভাবে কষ্ট পায় এবং যম কিঙ্করদের হাতে নিপীড়িত হয়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

২. যারা জীবিত অবস্থায় যে প্রকারে অন্যের প্রতি হিংস-বিদ্বেষ করেছিল, নরকে তাদের সেই প্রকারে শাস্তি দেওয়া হয়।

এভাবে পাপীদের নরকে শাস্তি দেওয়া হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহ নষ্ট হয়। তখন কর্মফল ভোগের জন্য তার সূক্ষ্ম দেহের উদ্ভব হয়। ঐ সূক্ষ্ম দেহ নিয়েই জীব যন্ত্রণা ভোগ করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• **কোন কোন ব্যক্তি স্বর্গ ও নরকে যাবে বর্ণনা করুন।**

সারসংক্ষেপ :

মানুষের শুভকর্মের পুণ্যময় ফল ভোগের জন্য মৃত্যুর পর যে সুখময় ফল লাভ হয় তাকে স্বর্গ বলে। আর পাপকর্মের ফল ভোগের জন্য যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাকে নরক বলে। স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগের জায়গা। আর নরকে পাপ কর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ইউনিট : ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মনুসংহিতায় ধর্মের কয়টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে?
ক দশটি খ.ছয়টি
গ.পাঁচটি ঘ. বারোটি

২. বেদ শব্দের অর্থ কী?
ক. সৎ খ. মহান
গ. বৈরাজ্ঞ ঘ. জ্ঞান

৩. জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর কেমন ?
ক. ব্রহ্ম খ.আত্মা
গ. ভগবান ঘ.প্রভু

৪. কে সর্বকর্মের ফলদাতা?
ক. ব্রহ্মা খ.ভগবান
গ.ইশ্বর ঘ.প্রভু

৫. মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে –
ক. ভক্তিলাভ খ.মোক্ষলাভ
গ.ধনলাভ ঘ.জ্ঞানলাভ

৬. নিষ্কাম কর্মের বৈশিষ্ট্য হলো –
ক. আমার কর্ম আমি করি খ. কর্মফলের ভাগীও আমি
গ. সৎ ভাবে কর্ম করা ঘ. ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ

৭. জগতের সবকিছু কেমন ?
ক. ব্রহ্মময় খ.মায়াময়
গ. ভাবময় ঘ. শক্তিময়

৮. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞানীর কয়টি লক্ষণের উল্লেখ আছে ?
ক.দশটি খ.বারোটি
গ. ষোলোটি ঘ. কুড়িটি

৯. কোন সূত্রে ভক্তির লক্ষণ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে ?
ক. শিবসূত্রে খ.শান্ডিল্যসূত্রে
গ. ব্রহ্মসূত্রে ঘ. ব্যাকরণসূত্রে

১০. ভক্তির লক্ষণ কয়টি ?
ক. ছয়টি খ.সাতটি
গ. আটটি ঘ. নয়টি

১১. কোন মুনি মানুষের জীবনকে চারটিভাবে ভাগ করেছে?
ক. গৌতম মুনি খ. বিশ্বামিত্র মুনি
গ. পরাশর মুনি ঘ. অগস্ত্য মুনি

১২. পঞ্চাশ বছর থেকে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত–
ক. ব্রহ্মচর্য খ. গার্হস্থ্য
গ. বানপ্রস্থ ঘ. সন্ন্যাস

১৩. আমাদের দেহ কীভাবে গড়া?
ক. পঞ্চভূতে খ. ষড়ভূতে

গ. নবভূতে ঘ. আদিভূতে

১৪. জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কোন বাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে?
ক. কর্মবাদের খ. জ্ঞানবাদের
গ. ভক্তিবাদের ঘ. অবিনাশিতাবাদের

১৫. ধর্ম শব্দটি কী ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে ?
ক. মৃ খ. কৃ
গ. ধৃ ঘ. স্মৃ

১৬. সমস্ত বৈরাজ্ঞের অধীশ্বর কাকে কল্পনা করা হয় ?
ক. ব্রহ্মাকে খ. দেবতাকে
গ. শিবকে ঘ. ভগবানকে

১৭. জ্ঞান লাভের অধিকারী ব্যক্তি –
i. যিনি আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানেন।
ii. যিনি সবকিছু ব্রহ্মময় দেখেন।
iii. যিনি সত্য কথা বলেন।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i , ii ও iii

 # নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১৮ থেকে ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
জ্ঞানেন্দ্র বাবু একজন সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর বয়স চল্লিশ। তিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করেন। তার কর্মে কোনো কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। তিনি সর্বকর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। তবে তিনি এসব কর্ম সংসারে বসেই করছেন।

১৮. জ্ঞানেন্দ্র বাবু কোন ধরনের কর্ম করছেন ?
ক. সকাম কর্ম খ. নিষ্কাম কর্ম
গ. নিত্য কর্ম ঘ. অনিত্য কর্ম

১৯. জ্ঞানেন্দ্র বাবু কর্মের জন্য কী ফল পেতে পারেন ?
i. ঈশ্বরপ্রাপ্তি
ii. আধ্যাত্মিক মুক্তি
iii. মোক্ষলাভ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২০. জ্ঞানেন্দ্র বাবু কী মনে করে সংসারে বসে কর্ম করছেন ?
ক. জনসেবার জন্য খ. সন্তান পালনের জন্য
গ. গার্হস্থ্য ধর্মের জন্য গ. ধর্মচর্চার জন্য

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১.ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।
২. ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।
৩. জন্মান্তরবাদ বলতে কী বোঝায়?
৪. ইহলোকে গার্হস্থ্য ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেন ? ব্যাখ্যা করুন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১.সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্মের ধারণাটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা করুন।
২. জ্ঞানই সবচেয়ে পবিত্রযোগ, আলোচনা করুন।
৩. ভক্তির মাধ্যমেই ভক্ত ভগবানের অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন, ব্যাখ্যা করুন।
৪. ইহলোকের স্তর কয়টি? ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুশীল ও রজত দুই বন্ধু। সুশীল সৎ চরিত্রের অধিকারী। তিনি কখনও পাপ কাজ করেন না। যা কিছু সত্য-সুন্দর-আদর্শমন্ডিত তার ধারক তিনি। অপরদিকে রজত খারাপ চরিত্রের অধিকারী। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ নানা খারাপ কাজের সাথে সে যুক্ত।

ক. স্বর্গের রাজার নাম কী ?
খ. যজ্ঞ বলতে কী বোঝায় ?
গ. রজত কীভাবে স্বর্গে যেতে পারে আপনার পঠিত বিষয়বস্তর আলোকে ব্যাখ্যা করুন ?
ঘ. সুশীল ও রজত চরিত্র দুটি আপনার পাঠ্যাংশের আলোকে বিশ্লেষণ করুন ?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–ইউনিট :৪

১.ক, ২.ঘ, ৩. ক, ৪. গ, ৫.খ, ৬.ঘ, ৭.ক, ৮.ঘ, ৯.খ, ১০.ঘ, ১১.গ, ১২.গ, ১৩.ক, ১৪.ক ১৫. গ ১৬. ঘ ১৭. গ ১৮. খ ১৯. ঘ ২০. গ।